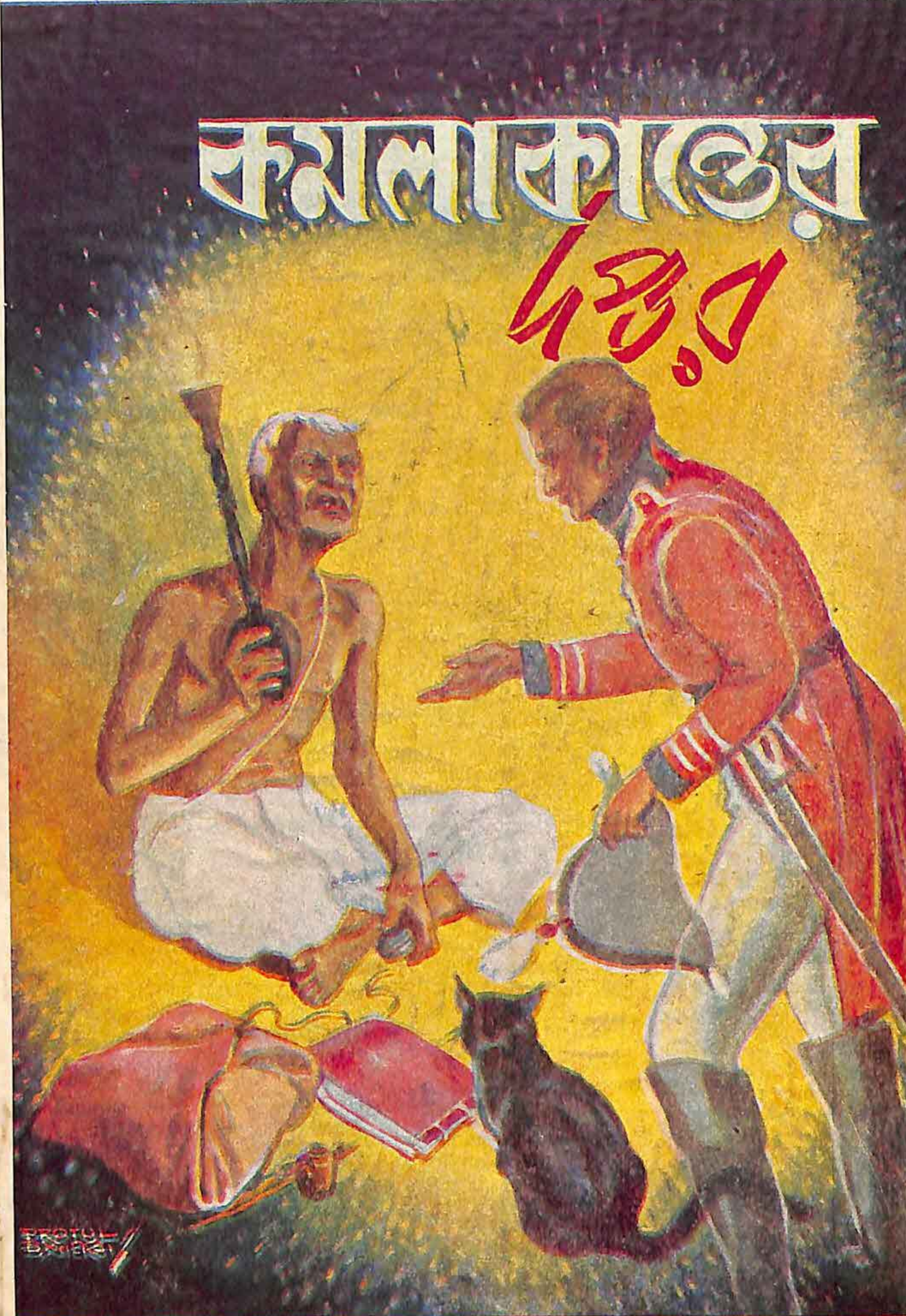
কমলাকান্তের দপ্তর



পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

বঙ্কিম-গ্রন্থমালার ১৪নং গ্রন্থ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

কমলাকান্তের দপ্তর



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

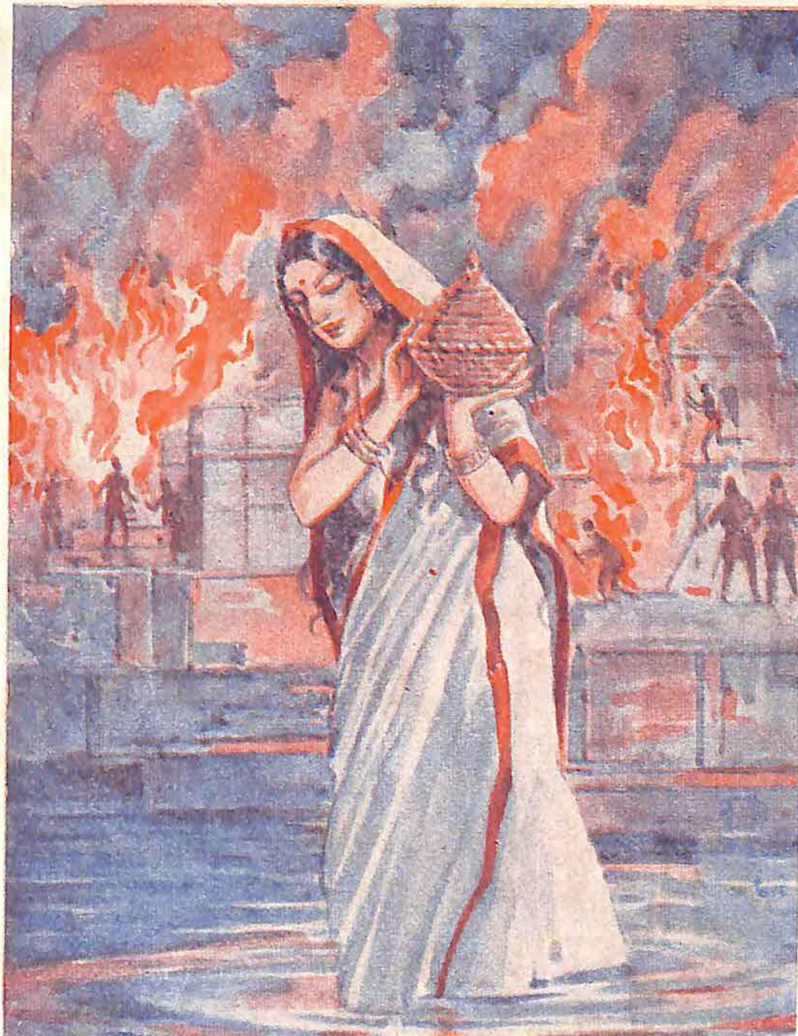
মে
১৯৮৫
১৩

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার





...সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন...

সম্পাদকের ভূমিকা

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি। বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। কমলাকান্ত একজন সেকেলে-ব্রাহ্মণের কাল্পনিক নাম। এই কাল্পনিক চরিত্রের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনের মূল প্রয়োজনীয় কথাগুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

কমলাকান্ত রসিক ও ব্যঙ্গপ্রিয়। তাহার ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার উপর নির্ম্মম কশাঘাত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাহিত্যে ইহা আদর্শ হইয়া আছে।

কমলাকান্ত দেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক। কমলাকান্তের প্রার্থনা—বাঙালীর অন্তরের প্রার্থনা। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর উচিত, কমলাকান্তের দেশ-জননীর নিকট প্রার্থনাকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা।

কমলাকান্তের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে আমাদের জাতীয় যে মহাসত্য নিহিত আছে, প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর তাহা একনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

কমলাকান্তের উক্তিগুলি তরুণ ছাত্র-ছাত্রীর মনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নতুন করিয়া সাজাইয়াছি।

এই গ্রন্থের রচনাবলী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়,—মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন, নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কালেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট গিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর. ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন,......বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-

জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাঁহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্।"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

কমলাকান্তের পরিচয়

[শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস এই ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাল্পনিক-সৃষ্টি ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত শর্ম্মার নিম্নলিখিত পরিচয় দান করেন।]

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজী, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্সপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত, বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারে পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটি পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন।

নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল।" সাহেব নূতনতন্ত্র পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখনও দারপরিগ্রহ করে নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ডু লিখিত কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত— শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে —যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

কে গায় ওই ?

বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে; পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্‌বুদ্‌সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ্‌ না হই? বিন্দুবিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে, মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ

একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেকদিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিনীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল।

পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূব করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম, আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম, আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি

কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছকল্লোলিনী-শীকরসিক্ত, বসন্ত-পবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিন কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিন কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখম বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখ জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক ন্যই! এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।

—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি!

উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনই সংসারে এক সঙ্গীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনি-সংমিলিত, বহুকণ্ঠ-প্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মনুষ্য ফল

আফিমের একটু মাত্রা বেশী চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল-বিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্‌রায়, কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণ-ভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায় ;—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল,কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল তুতুড়ি-সার গোরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্‌না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের

দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই; যদি কাটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই, নইলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সংবাদপত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ-মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পাই না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল নয়, পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্য জাতি-মধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম্র ছিল না, সাগর পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এদেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলা আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি কাঁচা মিটে আছে—পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলি জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পর ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।



কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা, কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক, কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্ম্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখনও কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণনার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়। নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেবল উজ্জ্বল শ্যাম,—কেমন জ্যোতির্ম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে,—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়,—উভয়েই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে, কিন্তু দেখ,—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্রমাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না, বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না, তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে।

আম্রের ন্যায় ডাবকেও বরফজলে রাখিয়া শীতল করিও, বরফ না জোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এইজন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবের আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি দুটি চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার

সাধ্য কি ? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন—অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়! মেরি সমরবিল্ বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, *জেন অস্টেন বা জর্জ্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই,* কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোব্ড়া—স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্ড়া নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুইই বড় অসাড় ;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্ড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়, স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথটানা বারণের আইন হইবে, তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের একেকেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে !*

---

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে ; কেন না, পুরোহিতই বিবাহ দেয়। উঃ ! কি পাষণ্ড !—

—ভীষ্মদেব

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল জোটে না। আমি যেমনি মানুষ, তেমনি গাছে, তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়,—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে, যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা কমলাকান্ত ভক্তিভাবে নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেল তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে এক-জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া-গাছে তত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর; ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু অধম ধুতূরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের

গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে ছুটো ধুতূরার বীচি সাজিয়া দাও—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে ছুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দাও; নেশা জমিয়া উঠিবে। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপন আপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট ছুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজ কাল মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু ছুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল, তবে এক গুণ মানি, ইঁহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল; সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যে কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যে অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা-চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাঁহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদিগের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের ডাল আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানে না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া

দিলে, তবেই তাঁহারা উঁচুতে ফলিলেন—নইলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপে কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড। তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমন বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারী জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উদর দর্শন

(ইউটিলিটি * বা উদর দর্শন)

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমি এই হিতবাদ মতে অমত করি না, বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন-অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ,

---

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল্" শব্দে চাষ করা, "ইট" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা বলিতে পারিল না। কিন্তু বোধ করি, কমলাকান্ত "ইউ টিল্-ইট-ই"পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও।" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখা পড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—

—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সেই সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই :—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পূরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পূরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরমপুরুষার্থ।

ভাষ্য।

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর-পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পূরিয়া উঠে তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত!

ভাষ্য।

'বিহিত'—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন!

ভাষ্য।

(১) "বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে বা পড়িতে শিক্ষার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

(২) "বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা তূলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

(৩) "পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

(৪) "উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা

বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষ-কীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

(৫) "বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ-চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক-হাঁক—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরেজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি—দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্দ্ধতিপান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্‌বিধ, যথা—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল, চড়-প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত—

"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

ত্বাচ—প্রহার-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

(৬) প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্যজীবী। প্রমাণ—দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমান—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে, পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি, এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহারা চিরপ্রথিত

প্রতারক, ইঁহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইঁহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইঁহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা হইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালী বাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান সময় সময় ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-এশিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক এবং পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইয়াছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ-দর্শন এবং উদর-দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

পতঙ্গ

বাবু বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি মোসায়েবি-ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন—আমি আফিম চড়াইয়াছি। ঝিমাইতেছি।

বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া-পরম্পরায় একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ—ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম-প্রসাদাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলাম। শুনিলাম পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

"দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে,—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতরে ঢুকিয়াছ—আমরা

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই, প্রবেশ করিবার পথ পাই না। পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে, আমাদের চিরকালের হক। আমরা পতঙ্গজাতি পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন প্রভু? আমরা গরীব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পারিব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না, আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময় আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক! আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

শুন, যদি জ্বলন্তরূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গ জাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?

এই শরীর লইয়া কি করিব? নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন, বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপ শিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না; তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ পোড়াইতে জন্মিয়াছ; আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক। আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের

গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু, আমার জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল, থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি। "বোঁ—ও—ও—"

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

*　　　*　　　*

নশীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নশীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটি বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া তামুক টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য-মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি—সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়; যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত।

যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে

পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়; সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। অনেকে রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন, জগতে অতুল কাব্য-গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"; ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত", ঈর্ষাবহ্নির "ওথেলো", গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।

বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হার মানে, বিজ্ঞান হার মানে, ধর্ম্ম-পুস্তক হার মানে, কাব্যগ্রন্থ হার মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, বোঁ করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, "দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে।" মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব-কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেকৃচি-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুট্‌-ফুট্‌-বুট্‌-বুট্‌-টকবকো-ধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য সতৈল অভিষেকের পর ঝোল-গঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময়, বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন দ্বিতীয় দধীচির ন্যায় পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে

সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেষণে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা ; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়। তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, 'দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ ?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শুনিবি ?' সে বলিল 'শুনিব।' আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপি ব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয় ? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব, সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানালার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানালার নীচে নয়, তাহার গোহাল ঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ।

কিন্তু আজকাল সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহাল ঘরে আমার মন নাই।

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক

সুখ-স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুঁথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথায় গেল ?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই ; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই, এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী ; নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না।

আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্ম-বিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে ; প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয় এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা ; ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ ; ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয় ; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে, মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ

করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কিনা। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমন কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ।

মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে—যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসার-তত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের সুখের মূল আছে কিনা? নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাববান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে, কিন্তু কত দিনে? হায়, কে বলিবে কতদিনে?

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকার বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোক শিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশে ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে

বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে : "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেইলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জাল-নিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছ, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা-নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? না পার, তবে তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা যে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্চার যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা মতি, টাকা গতি। টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে; ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর। যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য

---

* বাহ্য সম্পদ্

হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পূরিয়া যাউক। মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই: টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্! হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্র-শ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সংবাদপত্র-সকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সংবাদপত্র কাঁসীদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া বঞ্চনা-বিল্ব-দলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই, ঢাক ঢোল,—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্। বাজা ভাই কাঁসীদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বাহা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই হিউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়ি কাঠে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের নাম করিয়া এক কোপে পাচাড় কর! হর হর বম্ বম্। কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর।

পূজা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ

নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী ; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না ? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না ? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই, পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব ? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি ?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ-নিবন্ধনে তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার ?

● চন্দ্রালোকে ●

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে—ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম—একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমল-ধবল-কিরণ-রাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে। লোকে নিজে অক্ষমতা নিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নশীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দসমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা আর কেহ ছড়াক্ আর না ছড়াক্ দেখিতেছি, তুমি ছড়াইয়া থাক, আর আজ আমি ছড়াইব।

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি.এ. না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর-খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা পট্ট-বসনাবৃতা একটি বংশখণ্ডিকা! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী, বি.এ, উপাধিধারী উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত নববঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ-খট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!! * প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চ শিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র দণ্ডিকা, একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ক্ষেমকুটপর্ব্বত নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যা-পুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল ভাই! তাঁহার এতদিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্কা দেশের নদী-সকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে সাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের ঊর্দ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলজি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম-পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল, এবং বংশদণ্ডিকার স্থাপন করিয়া, উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবনধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

---

* বোধ হয় এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। —শ্রীভীষ্মদেব খোসনবীশ।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি। আমি উইল করিয়া যাইব, সাতপুরুষ বিবাহ করিতে না হয়, তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশদণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব ; যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব ; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোম্‌টাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম। শশী! তুমি অনাথার কুটিরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক ; আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর ; বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক ; নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর ; যখন তরঙ্গিনী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীরপ্রবাহে মন্দ গতিতে সিন্ধু অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক। তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দাও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দাও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী ; তরুণের আশা-প্রদীপ এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী ; স্থির দীপধারী ; তুমি পথিকের পথ প্রদর্শক ; গৃহীর নৈশ-সূর্য্য ; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী ;

পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা; আর এই শ্মশান-বিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল। তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ, রসে রস, বিরসে:বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী। শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন। সকলে একবার হরি বল ভাই।

বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবলমাত্রা চড়াইতে হইল।

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্যমতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি, * ইংরাজিমতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালি শাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোপাল সহিত বারিহ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলীকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখসম্পত্তি বিসর্জন করিয়া—রাজ-পুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, সে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব না হি বলিব? আর যে বেড্-ফোর্ড—তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ

---

* হি, শী, কাহাকে বলে? শুনিয়াছি—দুইটি ইংরেজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ। —শ্রীভীষ্মদেব।

করিয়াছিল, তাহাকেই-বা হি বলিব না শী বলিব? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীয়ান, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী না হি বলিব? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক এক জন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব না হি বলিব?

বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন গায়িকা বলিল—"সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্র-স্তব্ধবৎ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন্‌গুলি হি, কোন্‌গুলি বা শী, তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তণকারিণীই হি এবং তাহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী, বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট্‌ হন।

ফল কথা, যখন আমি নিজে হি কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিংবা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী। কেন না, আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

সুতরাং শশি, পূর্ণশশি, আজ আমি তোমাকে ইংরেজি মতে শী স্থির করিয়া, সুস্থ শরীরে, খোস তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম।

এখন শশি একবার এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্রপথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত-সঞ্চালনে শ্রান্তিবোধ করিয়া মুক্তা-বিনিন্দিত স্বেদবিন্দু-সিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগন গবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোর চক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তিসাধন কর দেখি! একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

● বসন্তের কোকিল ●

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন, যখন নশী বাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেঠো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নশী বাবুর বৈঠকখানা পারাবতকাকলিসঙ্কুল গৃহ-সৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নশী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল,

আর নশী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহার বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে; বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া, রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্ন-প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু", তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু—উ"। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্ন-প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ"।

ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম স্বর। নইলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না।

এ পৃথিবীতে গ্লাডস্টোন ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন স্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

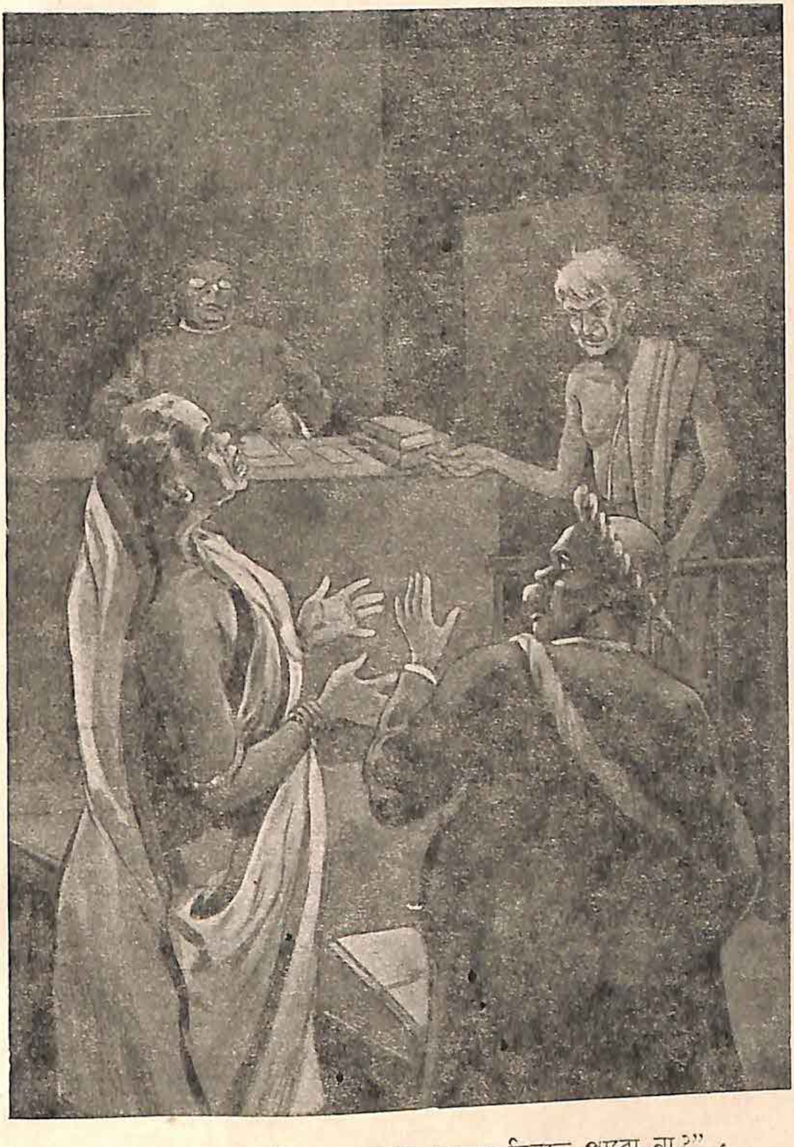
তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না; যাহা মিষ্ট—তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম,

আর আল্তা-পরা ছোট পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে স্বর পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট ; পায়ের পঞ্চম পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে ? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত, গান্ধার, নিষাদ, পঞ্চমের কি ধার ধারি ? যদি কেহ পাখোয়াজ, তানপুরা, দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা যায় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী ! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে-- সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে, আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসার-কাননে,—গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই –আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা, আমার পুঁজিপাটা এই আফিমের ডেলা ; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই, তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্ ? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে ?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি, যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে তিনি আত্মা, তাঁহাকেই ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান



—"আমার দুধ-দই চেনো, আর আমায় চিনতে পারো না?"

কথা ; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না। তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে কুহুরবে সাধা গলায় কোকিল একবার ডাক্‌ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্‌ দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্‌ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে বলা হইল না,—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী-মধ্যে উড়িয়া, কখন কি "কুহু" বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক্‌ দেখি রে!

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসীবাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম।

মল্লিকা-ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসান প্রায়, কলিকা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড়লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না।

জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাক, তাই তাহার বর পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! মেয়ে আছে?"

মল্লিকা বৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে।"

ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্! গুণ! গুণ্! মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ! গুণ! গুণ! গুণ্ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল!"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যা ঠাকুরাণী দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোনা আমার ইত্যাদি।"

কলিকা কতবার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কতবার বলিল, "ঠানদিদি, তুই যা।" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ-স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালিতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্। কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর বলিল, "ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্।

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র। তাঁর অনেক গুণাগুণ।"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়।"

এই সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম-প্রসাদাৎ দিব্যকর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয় পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া

গোলাবের মহিমা কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাববংশ বড় কুলীন; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালীর সন্তান, তাহার স্বহস্ত রোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাববাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া, খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গরা নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল। মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল, আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল; কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অস্বাস্থ্যকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবা-গোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীর দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া চলিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল।

অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে এক পাল পিঁপড়া মোসাহেব হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাহাদের পরিচয় শুনিবেন। সৰ্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হু-হুম করিয়া অনেক মরদানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর, বরযাত্র, সকলে অবাক হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিও বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত। নসীবাবুর নবম বর্ষীয়া কন্যা কুসুমলতা সূচ-সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসরঘরে লইয়া গেল। কত যে সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণী দিদি টগর সাদা-প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙা মুখে হাসি ধরে না! যুঁই কন্যার সই, কন্যার কাছে গিয়া শুইল। রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল। বকুল একে কলিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত নীল শাড়ি ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলাকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি, ঢুলে পড়বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল।—চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই।

কুসুম বলিল, "ওঠ না, কি কচ্চো ?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলী, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষিয়া কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে কাকা ?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ও পোড়া কপাল, ফুলের ? আমি বলি কি ! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি ।"

"কই ?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।"

দেখিলাম, সেই মালায় আমার বরকন্যা রহিয়াছে।

বড়বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরামবাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদগতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা। ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম।

কিন্তু হায়, মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত ! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে।

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথমদিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক ! এতদিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর। এতদিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাসজলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা।

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ। ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার

অনধিকার বুঝি না ; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে গোরু কাহারও নহে। গোরু গোরুর নিজের ; দুধ যে খায়, তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ-দই, চাল-দাল, খাদ্য-পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা-বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। যশঃ, মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনা মূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই এখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়।" সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদ্দি মাল পাচার করিবে। দোকানদার-খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে— অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে।

আমি গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে। যত

বেলা বাড়িতেছে তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে—মেছনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো। কল্পপুকুরের সস্তা মাছ অমনি ছাড়বো—বোঝা বিক্রী হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন-সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে তার পুনর্জন্ম হয় না।" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরম পুটি, বিক্রী হইলে উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে, জলে যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে, সংসারের দিন সুখে কাটবে, আমার এ সরম পুটির বলে।" কেহ বলিতেছে, "কাদা ছেচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়। কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

দেখিলাম, মাছের দালাল আছে। নাম পুরোহিত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কতদিন খাইব?" দালাল বলিল, "দুদিন, চারিদিন, তারপর পচিয়া গন্ধ হইবে।"

আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম।

* * *

তাহার পর কলু-পটিতে গেলাম, দেখিলাম, যত উমেদার, মোসাহেব কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও, যদি থাকে, এই ভরসায় পা টানিয়া লইয়া তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই-নাই—নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা তাই দাও—তেল দিতেছি।

শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তারপর যশের ময়রাপটী। সংবাদপত্র-লেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে-সন্দেশের দোকান পাতিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গছাইয়া দিয়া হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়

শুধু গুড়ে আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সস্তাদরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায় আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা বাবুর গাড়ীতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন।

অন্যত্র রাজপুরুষগণ মেঠাইওয়ালা সাজিয়া রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর খেতাবের-খেলাত, নিমন্ত্রণ ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া দোকান বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে।

এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতি সাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই, কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেই কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাই সকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশু-সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে; ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা

পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড়বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না। তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম– গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নসীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

আমার দুর্গাপূজা

[দুর্গাপূজা সম্পর্কে কমলাকান্তের এই প্রার্থনা বাংলা-সাহিত্যে অমর সৃষ্টি। কমলাকান্ত দেবী দুর্গার মধ্যে দেশ-জননীকেই মূর্ত্ত দেখেন। তাঁহার এই মাতৃ-বন্দনার প্রভাবে সেদিন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আসিয়াছিল। বাঙালীর চিন্তার সহিত কমলাকান্তের এই মাতৃ-বন্দনার সুর জড়াইয়া গিয়াছে।]

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম। যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোতমধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম,—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা?

হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী —মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা-প্রহরণপ্রহারিণী শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া, তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রী ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ-সুন্দরী চারু-পূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব;—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না

পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল-নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ, উঠ মা, বঙ্গজননি।

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে, "কত নাচ গো।—"বড় পূজার ধুম বাধিবে! কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী-ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে! কত নর্ত্তকী

নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্ত ডাকিবে—মা! মা! মা!

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥
দ্বেষক-দলনি, সন্তান-পালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে॥
জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে।
পাপ তাপ ভয় শোকনাশিকে॥

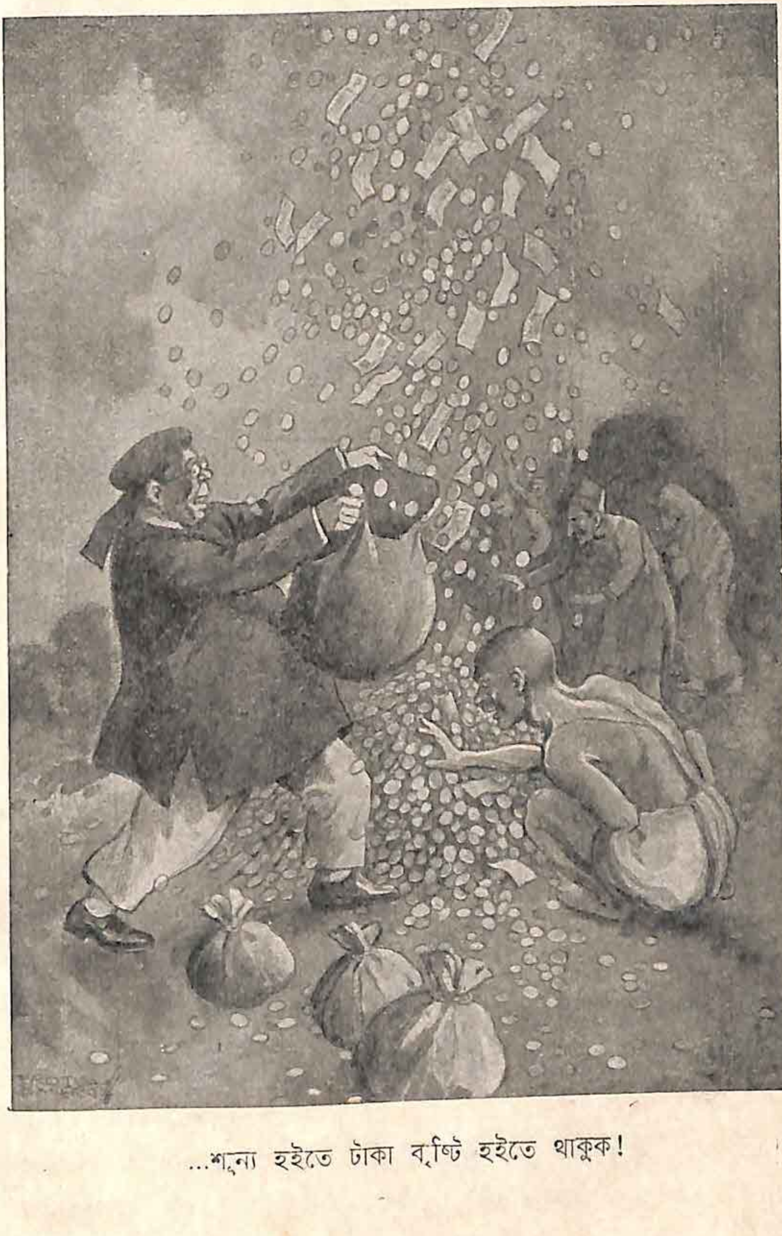
একটি গীত

[যে দেশকে প্রকৃত ভালবাসে, তাহার সেই ভালবাসা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। স্বদেশপ্রেম এমন সুগভীর, এমন একান্ত প্রেরণা যে, তাহার স্পর্শে জীবনের সমস্ত চেতনা একমুখী হইয়া উঠে। কমলাকান্ত একটি পুরানো বৈষ্ণব-কবিতার ব্যাখ্যা এখানে করিয়াছেন। সাধারণ লোক এই কবিতাটিকে প্রেমের কবিতারূপেই জানে। কিন্তু কমলাকান্ত তাহার প্রতি অক্ষরে প্রতি ছত্রে দেখিয়াছেন, দেশপ্রেমেরই অভিব্যক্তি। কমলাকান্তের নিকট, সব ভালবাসার একমাত্র আধার হইল দেশজননী।]

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

"এসো এসো বঁধু এসো আধ আচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা-ধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও, মাণিক নও, যে হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাই বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"



...শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক!

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহমন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈব-বংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

"এসো এসো বঁধু এসো"*

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাস-প্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্য-হৃদয়ে একমাত্র তৃষা, "অন্য-হৃদয় কামনা।" মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, ..."এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর-রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভব কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের

---

* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে! প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আধ-আঁচরে বসো"

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো! যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ-আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসন গ্রহণ করিও না—এই আমার শরীর-লগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিবনীত! হে আজন্ম-বিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কন্যাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত, অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার

জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে ? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিত-গমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে ; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায় ? শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায় ? প্রৌঢ় বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত। পরিতৃপ্তি রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ; জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য। হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না ; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায় ! কিসেই বা নয়ন ভরিবে ! নয়নে যে পলক আছে।

"অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে, কাল অপরিমেয়, মনুষ্যদুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্তকাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, একথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্বিবসহ যন্ত্রণা-স্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎ কেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস-গণনা দুঃখবিনোদন! কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ, সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ, আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই?

যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়, সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

"মণি নও, মাণিকও নও,
যে হার করে গলে পরি—"

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত। যদি রূপের শরীর প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে,—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায় তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি। তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিসরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো" পরে আদর,—"আধ আঁচরে বসো", পরে ভোগ—"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি—"অনেক দিবসে মনের মানসে, তোমা

ধনে মিলাইল বিধি।” সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,—“মণি নও, মাণিক নও যে হার করে গলে পরি।”

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

“আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!”

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ শারীরিক চাঞ্চল্য ; মানসিক অস্থৈর্য্য এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব! এ সুখ এক স্থানে ধরে না। যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব। এ জগৎ সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গে নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে! কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই? নব প্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি, সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

“তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।”

এই কথা সুখ দুঃখের সীমা-রেখা। যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে সে সেই সুখ-ভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে…বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনি দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য—ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল শত্রু-লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্যরাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন-চরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী আর সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে

পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ-ঐশ্বর্য্য কোথায়? ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শা-ফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া যবন-সেনা নবদ্বীপ আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্য-বীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিত অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল, যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনা রোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি, আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া, রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

"ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না —পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও।"

—কমলাকান্তের পত্র—বুড়া বয়সের কথা।

বিড়াল

[আমাদের ঘরে দুধ ঢাকা আছে, ক্ষুধার তাড়নায় বিড়াল সেই দুধ খাইতে আসে। তখন আমরা লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়না করি। কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না, তাহার ক্ষুধার খাদ্য সে কোথা হইতে পাইবে? কে তাহাকে ডাকিয়া তাহার ক্ষুধার খাদ্য দিতেছে? এই বিড়ালের কথা হইতে কমলাকান্ত দেশের দরিদ্র, নিরন্ন, রিক্ত, হতভাগ্য মানুষদের কথাই আলোচনা করিয়াছেন। জাতির যাহা সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, সেই সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।]

আমি শয়নগৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার, প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুরস্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব 'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার-স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতি-মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া সকাতরচিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম!

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও।" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারীর বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া,

হুঁকা হাতে করিয়া একটু বিচার করে দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরাও খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকার করাই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমাদের আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভোগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা,

পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও, একটা বড় রাজা ফাপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি! তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক, পণ্ডিতরা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল—হইতে পারিল—গৃহ-মার্জ্জার হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহার রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও!

খাইতে পাই না !—" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ 'মেও মেও' শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না, আফিংখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে না।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জ্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। সে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম,

"সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নশীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহা আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। যদি তুমি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও. এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম! লাঙ্গুলকর্ণতুল্যমানা গজেন্দ্রগামিণী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না। নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম; আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই —ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়।

আমি এই পরোপকার নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্য সাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমার-সম্ভব, পাণিনি, পাতঞ্জলি কেহ ধানকে-চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র, শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়—কোথায় না ঢেঁকি আর্য্য-সভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে? দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী; বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্য

দক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্ম্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public Spirit?

ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন, কিন্তু কই, তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আমিও শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। প্রসন্ন গোয়ালিনী—একদিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে, প্রণত শৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান! পশ্চাতে সেই ভীষণা রাক্ষসী। আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়!

কাজেই দৌড়ের চোটে হোচট খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে বিবরলোক প্রাপ্তি। "আলুথালু কেশপাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public Spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গ-ভীতি শূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে।

সেদিন সেই বিবর প্রাপ্তি হেতু আমার পরহিত কামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি

দধি-দুগ্ধ ক্ষীর নবনীত পরিবেষ্টিতা গোপকন্যা! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউভূষি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে, কাহাকেও গুঁতাইও না।"

প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সেদিন আমাকে পরহিত-ব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য "সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public Spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখন দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সেদিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুইজনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই। দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল! ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ! ঐ রমণী-পাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে! উঠিয়া পড়িয়া ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ। এস মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব? কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণী পাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া লেজ উঁচু করিয়া ঢেঁকশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে ধান্য, পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙা পা। আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে না কি ? ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও ? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয় ? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, মেঘে চড়িয়া বিদ্যুৎ ধরে,—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল খেচর খেচর করিয়া ধান ভান ? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার !

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি ? ৺নসীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালাঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারী বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে— ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম।

আমি সেখানে চারপায়ীর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশালা। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভাঙ্গিয়া বাহির করিতেছেন আইন।

বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল-গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ। তাঁর গৃহিণী একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম, লেখক ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুল বুক।

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি। নেশার গড়ে মনোদুঃখ-ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছে। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল, এ চাউল মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব।

তখনই স্বর্গে গেলাম—অশ্ব-মনোরথে। স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌সিস হুকুম করিলেন, একসের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে একসের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—নেশাখোর, বিটলে, পেটার্থী ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলাকান্তের পত্র

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু। *

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোষনবীশ জুয়াচোর লোক, আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম— আমি দপ্তরটি তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম। তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।

এই জুয়াচুরির কথা আমি এতদিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি জোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা জোড়াটি বান্ধা ছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলে-ব্যবহার্য্য

* কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনী ধারণ! সার্থক তাহার নিশাথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধুজনের চরণের সঙ্গে কোন প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য।

এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমার এ পূর্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।"

আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশংসা করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি বঙ্গদশন অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। এইরূপ বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হইবে!

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব, এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺নসিধাম" লিখিয়াছি অর্থাৎ আমার নসীবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন। ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আবার দপ্তরের জন্য আপনি খোষনবীশ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব।

আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটাকতক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। এ কমলাকান্তি কলে ফরমায়েসমত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক-নবেল চাই, না পলিটিকসের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ব্যবহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিক তত্ত্বরসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয় তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার-সমাবেশ করিব।

যদি গুরুবিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু-বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোষনবীশ মহাশয়ের পুত্র এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম. এ. পাস করিয়া বিদ্যার

ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু-বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বই চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন।

গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈত্রিক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোক ধন্য ধন্য করিয়াছিল!

তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোম্‌ত ও হর্বার্ট স্পেনসরের মতখণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারিপাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপর ভারি রকমের গুরু বিষয়ক গ্রন্থ হইয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনা কালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয়ক ছাড়িয়া লঘু-বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোষনবীশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে, নায়িকার নাম চন্দ্রকলা না শশিরন্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরন্তা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোঽস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য 'নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ'

কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোষনবীশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কিনা, ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইকসোট বা জিলবার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না, আমার পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোষনবীশের ছানা জীমূতনাদ বধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোষনবীশী রচনা ছাড়িয়া সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই-ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব। ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না।

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

পলিটিক্স্

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স্; কি বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুকুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণমনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক-একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়-নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স্—এই কুক্কুর ত' পলিটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে,

কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল কলুপুত্র কিছু বলে না —বড় সদাশয় বালক, কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল,— তাহার পলিটিকেল্ এজিটেশ্যন সফল হইল—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর-একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু-মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ছেলের কাছে একটা কুক্কুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্ব্বক বহুবিধ রাগ-রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর-একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের খোল-বিচালিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাব্‌না খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমান্ হইলেন।

কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়-মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে-দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন; আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।

বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব

আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এ ফুলগুলি আমার সখাসখী হইবে।

খোসামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোলতা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যান, লীগ, সোসাইটী, ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন। গুন্গুনের দল তাহাতে কোনমতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটিরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল, আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে

লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—"পপাত ধরণীতলে !!!" এই সংসার-সমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ?"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল।—আমি অহিফেন-প্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্‌ঘ্যানে? তোমার এ বনভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্-ঘ্যান করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেল্‌ভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি উমেদারীর ইচ্ছা রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রি-দিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরীর উমেদওয়ার—তাঁর ঘ্যান্‌ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। আবার কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্‌ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়ো জমা করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি; বড় চাকরী পাই —না—এসো বাপু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি—রমাকান্তের মা মরিয়াছে

এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন ; আর তুমি যে বাপু, আমার ঘ্যান্ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমি ও কি করিতে বসিয়াছ ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ! আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু ?

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত। তোমাদের জাতির ঘ্যান্ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবা-রাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ, হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না, আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত। স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল। সে যাক, মধু সংগ্রহ কর, কাজে মন দাও। শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ আর ভাল লাগে না।"

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে ? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম।

বুড়া বয়সের কথা

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি, এমত নহে—আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক, স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয় ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, তথাপি, হয়ত আপনি প্রাচীন। নয়ত আপনার কেশগুলি শাদাকালোয় গঙ্গা-যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন-মুক্তাপাঁতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণা মাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে, ইহার অর্থ—"বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে,—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়; কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় ত যমভয়ে নিতান্ত ভীত। আবার যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বুড়াই ভালবাসে, নয় পাড়িত, নয় কোন বড় দুঃখের দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া প্রথম চস্‌মাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কিনা! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে

মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই একগাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চির-প্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন। প্রভাতের বায়ু, বকুলকামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই।—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানীর দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চসমা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়াবয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া এ দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি; অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশাভরসা কিছু নাই? কই—দূর হউক, যাহা নাই, তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবন-কানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসা-পরিপূর্ণ, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই! কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুর দোষেও নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃণ্ময়ি? হে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি? আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্তকাল শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্পদিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই! বিপদ্ কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া। তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজ আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর।" বরং আমোদ-আহ্লাদকালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্রহস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সংবাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল তুমি আজ তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে! যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাব, চন্দ্র-মল্লিকা, ডালিয়া প্রভৃতি আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে ছোলা-মটরের চাষ, হারাধন গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সকল জ্বালার উপর জ্বালা—আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম, এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয় বন্ধু দাস্থ মিত্র যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত—এখন সেই দাস্থ মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাস্থর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জল-পানের মধ্যে ছিল,—এখন দাস্থ নামাবলীভারে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবেনা। তবে কি করিব? হিন্দু-শাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসও সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস ৪০ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই।

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখন বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিসমার্ক, মোল্টকে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জার্ম্মাণ ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র্ প্রাচীন—টিয়র্ মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণ তন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিশ্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিয়ামেণ্টের রিফর্ম এবং আইরিশ চার্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষ্টমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না।—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা

বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ, দ্বেষ, ভোগাসক্তি, এ জন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এ জন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তন্যপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে—সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে,

ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, বিষয়চিন্তার মধ্যে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এইমাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে, আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে—প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারিদিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

—

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি-বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস্—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে-ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে-ধরা—আমি ঘুণে-ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে।

প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে; এখন হাসিকান্না। ছিঃ!—কেবল লোক-হাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নশী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র, এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম, কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে, যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার স, ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কমলাকান্তের জবানবন্দী

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি এক দিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরু চুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পূরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া..."

কমলাকান্ত (সবিস্ময়ে) কি বলিব ?

মুহুরি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি ?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে ?

হাকিম। ক্ষতি কি ? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল ?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি ?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমায় কি এ পদবৃদ্ধি হইত ?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধহয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological

Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিল,—এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।"

তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার। সাক্ষী বড় সেরকশ্।"

উকীল বাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive."

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই

মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে; যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব ; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।”

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহুৎ খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি ?”

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি ?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি ?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর! এ সব Contempt of Court।” হুজুর উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী।” সুতরাং উকীল আবার কলমাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন,—“বল। বলিতে হইবে।”

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি ?”

কমলা। আমি কি একটা জাতি ?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয় ?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে! বলি—তোমার জাত আছে ?

কমলা। মারে কে ?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন জাতির ভিতর ?”

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এই উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নশীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর?"

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল যে, আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পূরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল-ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলা। একপয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাই না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল, বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিথ্যা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামুনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বলিবে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিলেন, "লিখুন' পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল—"কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের ওপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না, সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা? আমি কখনও একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত ?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন ?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ-দই খেলে, আজ বল চিনি না ?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ-দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি, এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ। যখনই দেখিতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দধি ফিকে তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি, দুধ-দই চিনি নে ?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ-দই চেন, আর আমায় চিনতে পার না ?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনতে পেরেছে, দিদি ? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে ওঠে ?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে ?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে ?

কমলা। বামনের ছেলে আর গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না ? কে জানে, তুমি ওর পোষ্য-পুত্র কি না ?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে,

একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই লোক আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?—আমার দুধ-দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি, গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নশীবাবুর একটা বক্‌না,—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া, গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায় উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা, চিনি বই কি—নইলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালিনীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটিবাবু সেইদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি ? একটি বই তো সামনে নাই ?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা ?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি ?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি ?"

হাকিম। কেন ?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি ?

কমলা। ইহলোকে তো আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার ?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না ?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন ?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"

হাকিম তখন একজন কনস্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নর গাই দেখাইয়া দেয়। কনস্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। শিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও শিং-ওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার।

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিলেন, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিটলে! গোরু তোমার?"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার? আমি ওর দুধ খেয়েছি—ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি,—ওর ননী খেয়েছি,—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হ'লো?"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile! Permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি? আমায় ক্রস্ করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনূমান তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর গর করিয়া কাটারা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটারায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর

বাবা, ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা, সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!' উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল, ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে, ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয় দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না।"

কমল। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটি,—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জল্‌দি জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির; শেষবয়সে উত্তরাধিকারীর; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা-গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটি কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল্ বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটি, গোরু-চোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে, আদালত

মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে ?"

কমলা। আজ্ঞা হঁা।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে ?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায় ?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে ?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। এক জন তো ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি ?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে ?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না ? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্ করিলেন, পবনাত্মজ মহাশয়। তার পর ক্রস্ করিলেন কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন ?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়!

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে!

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন আর জেরা করিলেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন, বাবা ?"

উকীল আর জেরা করিলেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকো

---

* অঙ্গদ

হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারিদিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য—তোর ছুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন হে, "বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।* এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law, যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয় তবে Right of Theft কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা, নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস জুনিয়র।

"ইংরাজ সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, 'ওটা DeQuincy-র Conefessions of an English Opium-Eater-এর অনুকরণ।' উহা পণ্ডিতের যোগ্য ব্যক্তি নয়। কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers-এর Sam-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে, তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব, উহাতে কামলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।"

—অক্ষয় চন্দ্র দত্তগুপ্ত।

---

* শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

সমাপ্ত

বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাদুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন্
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিটলার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ কলিঃ-৯